গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ২৩ জুলাই, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

রাষ্ট্রের স্বরূপই নগ্ন হল

যাদের বলা হয় অবলা নারী, সেই নারীদের সম্ভ্রম, মর্যাদা এবং আবেগে যখন মর্মান্তিক আঘাত লাগে, যখন নারীর নিরাপত্তা দিনের পর দিন ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, আত্মসম্ভ্রম বাঁচাতে লজ্জায় মুখ না লুকিয়ে যখন তারা প্রতিবাদে এগিয়ে আসে, অশ্রুকে পরিণত করে ঘৃণায়, যখন ক্রোধ হয় প্রতিরোধ, তখন হাজার কারফিউ জারি করেও, মিলিটারি নামিয়েও যে তাদের নিরস্ত্র করা যায় না সম্প্রতি মণিপুরি মহিলারা তাই দেখিয়ে দিলেন। তাঁদের সকল ধৈর্যের বাঁধ আজ ভেঙে গেছে। তাঁরা বারবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, রক্ষক নামধারী এই ভক্ষকদের হাতে তাঁদের মানসম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে, প্রাণ চলে যাচ্ছে তাঁদের সন্তানদের।

বি এস এফ, সি আর পি এফ, প্যারা মিলিটারি ফোর্স, আসাম রাইফেলস উগ্রপন্থীদের দমনের নামে দীর্ঘকাল যে উৎপীড়ন চালাচ্ছে, তাতে মণিপুর আজ যেন এক বারুদের স্তূপ।

গত ১১ জুলাই আসাম রাইফেলস্-এর ১৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা থংজম মনোরমা নামে ৩২ বছর বয়স্কা এক মহিলাকে জঙ্গিদের সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। গণধর্ষণ করার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য তাঁকে গুলি করে হত্যা করে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটি বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে ফেলে রেখে যায়। মনোরমার গুলিবিদ্ধ দেহ ক্ষোভের পুঞ্জীভূত বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। প্রতিবাদে স্বাভাবিকভাবেই গোটা সমাজ ক্রোধে ফেটে পড়ে। ৪৮ ঘণ্টা মণিপুর বন্ধ পালিত হয় দোষী সেনাদের শাস্তির দাবিতে। কিন্তু যথারীতি সরকার, প্রশাসন নির্বিকার, শাস্তির কোন ব্যবস্থাই হয়নি। এবার রাস্তায় নামেন মহিলারা। ১৫ জুলাই আসাম রাইফেলস-এর ৯ নম্বর সেক্টরের আঞ্চলিক সদর দপ্তরের সামনে নিজেরা বিবস্ত্র হয়ে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। তাঁদের চোখমুখ থেকে ঠিকরে পড়ছিল তীব্র ঘৃণা, ব্যানারে লেখা ছিল 'ভারতীয় সেনারা এসো, আমাদের ধর্ষণ কর', 'আমাদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাও'। মা-বোনেদের প্রতিবাদের এই রূপ আমাদের দেশে বোধহয় নজিরবিহীন।

আটের পাতায় দেখুন

মণিপুরে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে কমরেড নীহার মুখার্জী

"৩২ বছর বয়স্কা মণিপুরী রমণী থংজম মনোরমা ১৭নং আসাম রাইফেলস্-এর জওয়ানদের দ্বারা অপহৃত, ধর্ষিত ও গুলিতে নিহত হওয়ার সংবাদে ক্রুদ্ধ একদল মহিলা গত ১৫ জুলাই ইম্ফলের রাজপথে যেভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তা লক্ষ করে করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৬ জুলাই এক বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের এই বর্বরোচিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কমরেড মুখার্জী তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং ঘটনার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। সেই সঙ্গে সেনা জওয়ানদের এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ জুলাই কলকাতায় এম এস এস-এর বিক্ষোভ মিছিল

১৯ জুলাই এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভে সালিশী বিলের প্রতিরূপ পোড়ানো হচ্ছে

এই শিশুমৃত্যু মর্মান্তিক

ফুলের মতো শিশুরা পড়তে এসেছিল স্কুলে। নিজেদের গৃহের পর স্কুলই হচ্ছে শিশুদের নিরাপদ স্থান, এভাবেই পিতা-মাতারা ভাবতে অভ্যস্ত, সমাজও এমন করেই ভাবে। সেই স্কুলই হয়ে গেল শিশুদের জন্য জতুগৃহ। তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে লর্ড কৃষ্ণ স্কুলে ১৬ জুলাই ৮৬ জন শিশু ছাত্রের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু যথার্থই মর্মান্তিক।

ওদের এই মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল? যেভাবে বাড়ির চারতলায় খড়ের চাল ছাওয়া ঘরে ক্লাস চলত, পাশের ঘরে উনুন জ্বেলে ঐ ছাত্রদের জন্য খাবার তৈরি করা হত, তাতে আজ না হয় কাল এমন ঘটনা প্রায় অনিবার্যই ছিল বলা যায়। কিন্তু শিশু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালয়ে এই চেহারাটা অনিবার্য ছিল না, যদি এ দেশের সরকারি দলগুলো ভোটের সময় জনদরদের যেকথা বলে, গদিতে বসে তার কণামাত্রও দেখাত।

আমরা কাগজে পড়ি, ভারত নাকি বিশ্বে অল্প কয়েকদিনেই ইকনমিক সুপার পাওয়ার হয়ে উঠবে, ভারতের সামরিক শক্তি বিশ্বে তৃতীয়, ভারত এখন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ পাওয়ার দাবিদার। নেতা ও মন্ত্রীরা বলেন, 'দেখো, দেশ কত এগোচ্ছে, জনগণ গর্বিত হও।' অনেকে হয়তো গর্ববোধও করেন। কিন্তু যারা দেশের অন্দরমহলের খোঁজ জানে, কোটি কোটি দুঃখী মানুষের একজন বলেই নিজেদের ভাবে, তারা ঐ গর্ববোধের শরিক হতে পারেনা।

আটের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে সমাবেশ

রানি রাসমণি রোড ● বিকাল ৪টা

প্রধানবক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী

২৯ - ৩১ জুলাই

কোটেশন একজিবিশন

মহাবোধি সোসাইটি হল

(কলেজ স্কোয়ারের নিকট)

সকাল ১০টা - রাত্রি ৮টা

ঝুপড়িবাসীদের উপর আক্রমণ

অসহায় ঝুপড়িবাসীদের স্বার্থে এস ইউ সি আই আন্দোলন করে সেইজন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা ক্ষিপ্ত। তাই কলকাতার হাইড রোড এলাকায় সামান্য আঞ্চলিক ঝগড়াকে কেন্দ্র করে তারা এস ইউ সি আই কর্মী ও সমর্থকদের উপর ৭ জুলাই রাতের অন্ধকারে পরিকল্পিত আক্রমণ চালায়। ভোজালি, লাঠি এবং লোহার রডের আঘাতে কয়েকজন গুরুতর আহত হন। দুষ্কৃতীরা বোমা ফাটিয়ে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘর লুঠ করতে থাকে। ঝুপড়িবাসীদের নিজস্ব সংগঠন 'নাগরিক উন্নয়ন সমিতির' অফিসঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। আরও কয়েকটি ঝুপড়ি তারা ভেঙে দেয়। টানা প্রায় চারদিন দুষ্কৃতীরা এলাকায় পুলিশের নাকের ডগায় পিস্তল, বোমা, ভোজালি, লাঠি, লোহার রড নিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়ায়।

উল্লেখ্য, এই এলাকায় ঝুপড়ি উচ্ছেদের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর জনপ্রিয় সংগঠক কমরেড উপেন্দ্র ভক্ত (মাস্টারজি) অগ্রণী ভূমিকা নেন ও এলাকার গরিব মানুষরা সংগঠিতভাবে বুলডোজার ফিরিয়ে দেন ১৯৯৯ সালে। সেই লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় তারাতলা, হাইড রোড, সোনাই, বি বি হল, খালবাড়ি, রংটাপ্লট, কোলবার্থ সহ বিভিন্ন এলাকায় গণআন্দোলন ও এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে। গত ৭ জুলাই রাতে এক দুষ্কৃতীর দলবল একজন নিরীহ ড্রাইভারকে মারধর করে। এলাকার সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ করলে তারা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালায়, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুঠ করে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মহিলারাও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। চারজনকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, কয়েকজনকে স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাতে হয়।

এই আক্রমণের ঘটনাকে এলাকার আপামর জনসাধারণ ধিক্কার জানাচ্ছেন এবং তাঁরা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

হুগলি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি আদায়

অন্যায়ভাবে কাটা বিদ্যুতের লাইন আগে না জুড়লে ঘেরাও চলবে — এই ঘোষণার পর স্টেশন ম্যানেজার দ্রুত লাইন জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করায় আলোচনা শুরু করলেন অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দ। গত ২৪ জুন বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ২১ দফা দাবিতে মগরা বিদ্যুৎ পর্ষদ ঘেরাও করা হয়। অ্যাবেকার হুগলি জেলা সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী, মণিমোহন ঘোষ, মহিউদ্দিন মোল্লা ও সীতাংশু তপাদারের নেতৃত্বে দুই শতাধিক সদস্য মিছিল করে বিদ্যুৎ পর্ষদ অফিসে উপস্থিত হন। ঐ দিনই কমপক্ষে ৫টি খারাপ মিটার না পাল্টালে ঘেরাও চলবে ঘোষণা করা হলে চন্দননগর থেকে ডিভিশনাল ম্যানেজার তাঁর নিজের কোটা থেকে জরুরি ভিত্তিতে ৫টি মিটার দিচ্ছেন, এই মর্মে টেলিফোনে মগরার স্টেশন ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়ার পর সন্ধ্যায় ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। গ্রাহকদের আন্দোলনের ফলে এই দাবি আদায়ে এলাকায় প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

বৈঁচির পর্ষদ অফিস ঘেরাও

গত ১০ জুলাই বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যায়ভাবে লাইনকাটার প্রতিবাদে মহিলা সহ শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক হুগলির বৈঁচি পর্ষদ অফিস ঘেরাও করে। স্টেশন ম্যানেজার অন্যায়ভাবে কাটা লাইন জুড়ে দিলে এবং অন্যান্য দাবিগুলি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে ঘোষণা করলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন আগে টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও লাইন না পাওয়া গ্রাহকদের পরদিনই লাইনের তার লাগানো শুরু হয়।

পুরুলিয়া জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে গত ৪ জুলাই পুরুলিয়ার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের তৃতীয় জেলা সম্মেলন বিপুল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ ব্যানার্জী। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অশোক নাগ আগত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস। তিনি আগত প্রতিনিধিদের সামনে সিইএসসি ও পর্ষদের গ্রাহকদের কীভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে এবং পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনকে কীভাবে বিভক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা তুলে ধরেন। তিনি আগামী দিনে পুরুলিয়া জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তুলতে সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট রাখেন রঙ্গলাল কুমার। মূলপ্রস্তাব পাঠ করেন গৌতম হাটি। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সুব্রত মুখার্জী। প্রতিনিধি সম্মেলনে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন তারকেশ চ্যাটার্জী, অমল মাইতি, নন্দলাল চৌবে প্রমুখ।

সম্মেলনে বিশ্বনাথ ব্যানার্জীকে সভাপতি, নন্দলাল চৌবে, তারকেশ চ্যাটার্জী, শৈলেন বাউরী প্রমুখকে সহ-সভাপতি, গৌতম হাটিকে সম্পাদক, সুব্রত মুখার্জীকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

প্রবল দুর্যোগের মধ্যেই পুরুলিয়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুতের মাশুল, শিক্ষার ফি, বাসভাড়া ও হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং পাটের ন্যায্য মূল্যের দাবি সহ নারীর নিরাপত্তার দাবিতে গত ১২ জুলাই মাথাভাঙায় বিক্ষোভ

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে ইউ টি ইউ সি-এলএস

কলকাতার মেয়রের হকার উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা করে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির পক্ষে হকার সংগ্রাম কমিটির সহ-সভাপতি বিধান চ্যাটার্জী ১৬ জুলাই নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, কলকাতাকে মেগাসিটি করার এবং কলকাতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার অজুহাতে কলকাতা পুরসভার মেয়র সুব্রত মুখার্জী হকার উচ্ছেদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমরা মনে করি এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে কয়েক লক্ষ মানুষ জীবিকাচ্যুত হবেন এবং অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন। আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে আরো লক্ষ করছি যে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় হকার নীতি প্রণয়ন করেছেন তখন তা কার্যকর না করে, বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদের মতো একটি অমানবিক পদক্ষেপ কলকাতা পৌরসভা নিতে চলেছে। আমরা পৌরসভার এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে হকাররা সক্রিয় প্রতিরোধে সামিল হতে বাধ্য হবেন। আমরা বিশ্বাস করি, সচেতন জনসাধারণ হকারদের সংগ্রামে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।"

মথুরাপুর ২নং ব্লক ও রায়দীঘি থানায়

সহস্রাধিক মানুষের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দীঘি থানার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে গরিব চাষী, মজুর ও মা-বোনেরা সুসজ্জিত মিছিল সহকারে ৯ জুলাই মথুরাপুর ২নং ব্লক অফিসের সামনে সমবেত হয়ে সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ও রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মূল দাবিগুলির মধ্যে ছিল পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, পঞ্চায়েত কর, জমির খাজনা, বিদ্যুৎ-পেট্রোল- ডিজেলের বর্ধিত মূল্য, বাসের বাড়তি ভাড়া প্রত্যাহার, সকলের জন্য রেশন কার্ড, সকল গরিব মানুষের নামের বিপিএল তালিকাভুক্তি, নদীবাঁধ মেরামত, গ্রামীণ মজুরের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরি, চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম প্রভৃতি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ সনাতন দাস, গুণসিন্ধু হালদার, উদয় মণ্ডল, ছোহরাপ নস্কর, জয়দেব সরদার, গোপাল সেন, বিজয় হালদার, হারানন্দ ময়রা প্রমুখ। বিডিও'র অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। রায়দীঘি থানাতেও পৃথকভাবে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জয়েন্ট বিডিও এবং ওসি প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন এবং বিষয়গুলি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। উপস্থিত জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড দিবাকর নস্কর, বিশ্বনাথ সরকার, রেণুপদ হালদার, ব্রজেন নাইয়া প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহদেব নস্কর।

নদীবাঁধ ভাঙন প্রতিরোধে নামখানায়

নাগরিক কনভেনশন

নদীবাঁধ ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১১ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানায় এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

কনভেনশনে অনিতা মাইতি যে মূল প্রস্তাবটি পাঠ করেন তার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে একদিকে মানুষের দুর্দশা ও ক্ষোভ এবং অন্যদিকে দাবি আদায়ের সুদৃঢ় শপথ। কমলেন্দু পাণি, উত্তম সাহু, রবীন্দ্রনাথ বেরা, হিমাংশু শেখর আদক, উদয়কান্ত মণ্ডল, সুকুমার গিরি, প্রজাপতি খালুয়া প্রমুখের বক্তব্যেও ছিল তারই প্রতিধ্বনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুধাখালির সত্যরঞ্জন মণ্ডল, বহু কষ্টে বসানো দুটি বরজই প্লাবনে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরই শোকে দুঃখে হতাশায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত এই মানুষটির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এদিন কনভেনশনে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে নীরবতা পালন করা হয়। প্রয়াত সত্যরঞ্জনবাবুর সদ্যবিধবা পত্নী অর্চনা মণ্ডল স্বামীর মৃত্যুর মর্মান্তিক মুহূর্তটি চোখের জলে বিবৃত করেন।

সভায় 'নামখানা নাগরিক কমিটি'র পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির সম্পাদিকা প্রতিভা মিশ্র এবং সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ প্রধান। সম্পাদিকা অসুস্থ থাকায় অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন কমলেন্দু পাণি। ইতিপূর্বে এই কমিটির নেতৃত্বে নামখানা-বকখালি বেহাল বাসরাস্তা সংস্কারের দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলন, এমনকী স্বতস্ফূর্ত নামখানা-বন্‌ধও সংঘটিত হয়েছে এবং এই কমিটি শেষ পর্যন্ত দাবিও আদায় করেছে। এবার সেই নাগরিক কমিটি নদীবাঁধ ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলনে নামায় মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

মন্দিরবাজারে আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার ব্লকের বিজয়গঞ্জ বাজারটি মূলত কুলপি রোডের এক কিমি দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। বহু বছর ধরে রাস্তার কোন সংস্কার না হওয়ায় এবং নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় এর বেহাল অবস্থা এলাকার মানুষের কাছ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে এলাকার এমএলএ, এমপি-দের বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি। তাই অবিলম্বে বাজারের রাস্তা মেরামত, জলনিকাশির ব্যবস্থা, ফুটপাত নির্মাণ, শৌচাগার স্থাপন ও যাত্রী বিশ্রামাগার স্থাপনের দাবিতে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে গত ৪ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই এক গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের কর্মসূচি নেওয়া হয়। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে ১৪ জুলাই বেলা ২টায় মন্দিরবাজার বিডিও-তে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ এই দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং ১৫ জুলাই থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেন। অন্যান্য সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের জন্য আরো ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে গণকমিটি গঠনের প্রস্তুতি চলছে। সমগ্র আন্দোলনটির নেতৃত্বে আছেন কমরেড প্রহ্লাদ পুরকাইত, ইউসুফ মোল্লা, শ্যামল প্রামাণিক, সঞ্জয় মণ্ডল, অধীর নস্কর প্রমুখ।

পবিত্র সরকারের ভুয়া ডিগ্রি

শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত জনগণ

শিক্ষার উচ্চমান এবং শিক্ষকতার আদর্শে দেশের মধ্যে যে বাংলা একদিন ছিল গৌরবের উচ্চ শিখরে, সেই বাংলাকে যেখানে টেনে নামানো হয়েছে, তা দেখে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজ বিস্ময়ে হতবাক। সাম্প্রতিককালে শিক্ষার নানান ক্ষেত্রে ফাঁস হয়ে পড়া দুর্নীতি ও দলবাজির ঘটনা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে গভীর মর্মবেদনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন এক প্রবীণ শিক্ষাব্রতী। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎই তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। শেষে কান্নাভেজা গলায় তিনি বলেন, '.....আমি আর বলতে পারছি না।' এইসব দুর্নীতির তদন্তের প্রশ্নে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আর এক প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ তীব্র শ্লেষের সঙ্গেই বলেন, 'তদন্ত! কে বা কারা সেই তদন্ত করবে?' যথার্থই এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত অবক্ষয় নেমে এসেছে। বেনজির এই অবনমনে সকলেই মর্মাহত। শিক্ষার প্রাঙ্গণ আজ বীভৎসভাবে কলুষিত। একদিকে গোটা দেশে শিক্ষাকে অসাধু ব্যবসায়ে পরিণত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রকে লাভজনক 'বিনিয়োগের' ক্ষেত্র হিসাবে দেখাতে চাইছে, বিপুল হারে ফি বাড়ানো হচ্ছে, ঘটানো হচ্ছে শিক্ষার বেসরকারীকরণ; অপরদিকে নেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো, স্কুল বিল্ডিং নেই, শিক্ষক নেই, বসবার জায়গা নেই, বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারি বই-এর সরবরাহ পর্যন্ত নেই। বর্তমানে এই হল রাজ্যের শিক্ষার চালচিত্র। একদিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার চাকরি না পেয়ে অসহায়ভাবে জীবন কাটাচ্ছে, অন্যদিকে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি। কলেজগুলিতে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নেই। 'পার্ট টাইমার' দিয়ে কোনও রকমে পঠনপাঠন চলছে। প্রতি বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, প্রশ্নপত্র ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলপ্রকাশের আগেই উত্তরপত্র মুদিখানার ঠোঙা হয়ে বিক্রি হচ্ছে অথবা রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। রেজাল্ট কেলেঙ্কারি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত। সংবাদপত্রে ইদানীংকালে প্রায়শই জাল মার্কশিট, ভুয়ো সার্টিফিকেট ইত্যাদির রমরমিয়ে চলতে থাকা ব্যবসার সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। জাল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে শিক্ষক অধ্যাপকের অবৈধ নিয়োগ হচ্ছে প্রাথমিক স্তর থেকে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত। এমনকী চাকরিতে নিয়োগের যে সমস্ত পরীক্ষা হয়, তাতে যারা প্রথম-দ্বিতীয় স্থানাধিকারী — তাদেরকে টপকে নিয়োগ করা হয় 'মেরিট লিস্ট'-এর তলায় থাকা প্রার্থীকে। সেক্ষেত্রে উচ্চ স্থানের অধিকারী আদালতে বিচার চাইলে যদি হাইকোর্ট তাকে নিয়োগ করার নির্দেশও দেয় — তাকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবাংলার সিপিআই(এম) দলভুক্তরা। পুলিশের নাকের ডগায় বসে তারা কুকর্ম চালিয়ে গেলেও পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা তাদের দেখতে পায় না। পশ্চিমবঙ্গে এর প্রচুর নজির রয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগের প্রধান শর্ত হল বৃহত্তম শাসকদল সিপিআই(এম)-এর প্রতি আনুগত্য। যদি কোথাও কোন কারণে অন্য কেউ নিযুক্ত হন — তাহলে তাকে সমস্ত প্রকারে হেনস্থা করাই সিপিআই(এম) দলের অন্যতম কর্মসূচি। কোনওভাবে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্যের নিয়োগ পুরোপুরি আইন ও রীতিসম্মত হলেও যেহেতু সিপিআই(এম) তথা রাজ্য সরকারের মনঃপূত ছিল না অর্থাৎ যেহেতু তিনি সিপিআই(এম)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নি — তাই তাঁর চার বছরের কার্যকালে তাঁকে বাস্তবে সুস্থভাবে কাজ করতেই দেওয়া হয়নি। সেই সময়ে সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠন, দলীয় কর্মচারীদের একাংশ শালীনতার সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দিনের পর দিন যে আচরণ করেছে এবং রাজ্য সরকার তাতে যেভাবে প্রত্যক্ষ মদত যুগিয়েছে, তা যেকোন সভ্য দেশে সত্যিই অকল্পনীয়। ২৭ বছরের সিপিআই(এম)-ফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে সংকীর্ণ দলবাজি আজ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, যেকোনও রকম অপরাধ করলেও তার কোন সুষ্ঠু বিচার হয় না — সিপিআই(এম)-এর দলভুক্ত হওয়াই সকল দুষ্কর্মের ছাড়পত্র। সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলীতেও নগ্নভাবে তা দেখা যাচ্ছে। জাল মার্কশিট এ্যাটেস্ট করে এবং জেনে শুনে সেই জাল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে চাকরি দিয়ে প্রাক্তন উপাচার্য দিলীপ সিংহ আজ জেল হাজতে — অপর একজন উপাচার্য পবিত্র সরকার জালিয়াতি করে নিজেকে ডক্টরেট বলে জাহির করে বহু পদে আসীন হয়ে প্রভূত সুযোগ সুবিধা ও সরকারি অর্থ ভোগ করে চলেছেন বহাল তবিয়তে। ভূয়া ডিগ্রি জাহির করে তিনি রিডার হয়েছেন, ভূয়া ডিগ্রি নিজের হাতে সই করে ছাত্রছাত্রীদের বইতে ছেপে সরকারি আনুকূল্যে তাকে বাজারে বিক্রি করেছেন, নিজে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী না হয়েও মিথ্যা করে নিজেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট বলে জাহির করেছেন অথচ প্রকৃত ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছাত্রকে মহাজ্ঞানীর মতো উপদেশ দিয়েছেন আত্মপ্রচার করো না। সিপিআই(এম)-এর প্রতি আনুগত্যের অপার মহিমার(!) জন্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও এহেন পবিত্র সরকারের পেছনে মদত যোগাচ্ছেন। এমনকী যে বছর কেউই ফার্স্ট ক্লাস পাননি, সেবছর পবিত্রবাবু 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' হয়েছিলেন বলে বিধানসভায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতিও দিচ্ছেন। রাজনীতিতে সংস্কৃতির মান কতদূর নামলে এবং চক্ষুলজ্জা কতটা বিসর্জন দিতে পারলে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এহেন আচরণ সম্ভব — ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার 'ককবরক সহ সাঁওতালি চাকমা, কুকি, হালাম ইত্যাদি ভাষার উন্নয়নের জন্য গঠিত উপজাতি ভাষা কমিশনের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ঐ ব্যক্তিকেই। এবং তাঁর মিথ্যাচার ও জালিয়াতি প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরও তাঁকে ঐসব উচ্চপদে বহাল রাখা হয়েছে। বর্তমানে দু'একটি এরকম ঘটনা সামনে এসে পড়ায় হয়ত পশ্চিমবাংলার জনমানসে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, যা প্রকাশ পেয়েছে তা জালিয়াতি-দুর্নীতি- দলবাজির 'হিমশৈলের' চূড়া মাত্র। প্রকৃত অবস্থা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

সমস্ত সরকারি পদ থেকে পবিত্র সরকারের অপসারণের দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ জুলাই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্রবিক্ষোভ

আমাদের দল বহুদিন আগেই এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একথা সকলেই জানেন যে, সিপিআই(এম)-ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপরিচালন সংস্থা সহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সংস্থাগুলিকে ভেঙে দিয়ে শীর্ষপদে দলের অনুগত কর্মীদের বসিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সমস্ত স্তরে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের তথা সিপিআই(এম) দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে এই নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে জনস্বার্থ-বিরোধী শিক্ষানীতিকে কার্যকর করা। আমাদের দল তখনই দেখিয়েছিল, এই পদ্ধতি গণতান্ত্রিক শিক্ষার রীতি-নীতি এবং মূল্যবোধকে সমূলে বিনষ্ট করবে। সকলেই স্মরণ করতে পারবেন, এই সিপিআই(এম) ফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষাকে বিসর্জন দেওয়ার কংগ্রেসী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য কী আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। বিজেপির স্লোগান — 'হিন্দি, হিন্দু হিন্দুস্তান'-এর মধ্যেও ছিল ইংরেজি হঠানোর প্রতি সমর্থন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন সেই বরেণ্য মনীষীদের শিক্ষা ভাবনার ধারাবাহিকতা ও যুগোপযোগী মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমাদের দল প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা বিসর্জনের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সে সংগ্রাম ছিল দীর্ঘস্থায়ী। প্রথিতযশা শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক থেকে শুরু করে ছাত্র, যুবক, মহিলা এমনকী চাষী-মজুররাও সে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। আন্দোলনের একটি পর্যায়ে যখন প্রয়াত ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ প্রতুল গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, শৈলেশ দে'র মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরা পথে নেমেছিলেন — তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআই(এম) নেতা জ্যোতি বসু তাঁদের প্রতি অশালীন কটুক্তি করে 'দুর্বুদ্ধিজীবী' বলেছিলেন। আর আজ যিনি ভূয়া ডিগ্রি নিয়ে নানান অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করছেন তাঁকে এবং এরকমই আরও কিছু ব্যক্তিকে বুদ্ধিজীবী সাজিয়ে সর্বনাশা শিক্ষানীতির পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। বর্তমানে এই সাজানো শিক্ষাবিদরাই শিক্ষাক্ষেত্রে

আটের পাতার দেখুন

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে ১৪ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, মানিক মুখার্জী, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, অধ্যাপক তরুণ নস্কর ও কমিটির সম্পাদক তপন রায়চৌধুরী

কেন্দ্রীয় সরকারে সিপিএম যোগ দিল না কেন ?

সকলেই জানেন, কেন্দ্রে বর্তমান সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকার গঠনের অন্যতম কারিগর হলেও সিপিএম এই সরকারে যোগ দেয়নি, তাকে বাইরে থেকে সমর্থন দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে বহু প্রশ্ন ছিল। সিপিএম নেতারা নিজেদের মতো করে এর জবাবও দিয়েছেন। শুধু সরকারে যোগ না দেওয়াই নয়, এমনকি গত ২২ জুন সংবাদপত্র থেকে এও জানা গেছে যে, সনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে যে জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হচ্ছে, সিপিএম তাতেও যোগ দেবে না। কারণ হিসাবে তাদের বক্তব্য হল, ন্যূনতম কর্মসূচির মতো উপদেষ্টা পর্ষদকেও তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গ বলেই মনে করে এবং যেহেতু তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক তারা হবে না, তাই তারা উপদেষ্টা পর্ষদেও যোগ দিচ্ছে না। কিন্তু সিপিএম নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জীকে দিয়ে লোকসভার স্পিকার পদ গ্রহণ করানোর পর একথা কি আর তাদের বলা চলে যে, সিপিএম কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের শরিক নয়? তবে একথা ঠিক যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় না যাওয়া, ন্যূনতম কর্মসূচিতে স্বাক্ষর না করা, এবং এখন জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদেও তাদের যোগ না দেবার সিদ্ধান্তের ফলে পুরোদস্তুর সরকারে যোগ দেওয়া বলতে যা বোঝায়, তা সিপিএম করেনি। কিন্তু কেন? সিপিএম নেতারা তাদের এই দলীয় সিদ্ধান্তের পিছনে জনসাধারণ ও তাদের কর্মী-সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার জন্য নীতি-আদর্শ ও জনস্বার্থ রক্ষার বহু কথাই বলছেন। অথচ বাস্তবে এবারের নির্বাচনের আগে ও পরে তাদের বক্তব্য ও ভূমিকা বিচার করলে, তাতে দ্বিচারিতা ও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে সুবিধাবাদ তো পাওয়া যাচ্ছেই; সাথে সাথে শ্রেণী রাজনীতির বিচারে যেটা পাওয়া যাচ্ছে, তাহ'ল, শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কথা মুখে বলে বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার যে রাজনীতি নিয়ে তারা পশ্চিমবাংলায় দীর্ঘদিন সরকার চালাচ্ছেন, সেই রাজনীতি।

সিপিএম বরাবরই বলে এসেছে যে, কোন সরকারে তারা তখনই যাবে যখন সেই সরকারের নীতিনির্ধারণ করার মতো ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। এবার লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলি মিলিতভাবে রিগিং করেই হোক, বা কংগ্রেসের সাথে জোট করেই হোক ৬১টি আসন পেয়েছে। সিপিএম নেতারাই বলেছেন, ইতিপূর্বে এতবড় বিজয় তাঁদের আর ঘটেনি। ৬১টি আসন লাভকে তাঁরা 'ঐতিহাসিক' বলেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সরকার গঠনের পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করাই শুধু নয়, এই সরকারের নীতি নির্ধারণে তাঁরা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আছেন একথাও নিজেরাই স্বীকার করেছেন। সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজেই বলেছেন, *"আমরা চেয়েছিলাম বামপন্থীরা কেন্দ্রে নীতিনির্ধারক শক্তি হোক, তা হয়েছে। আমাদের সমর্থনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন যে সরকার গঠিত হয়েছে, সেখানে আমরা 'হ্যাঁ' বললে এগোবে, আমরা 'না' বললে দাঁড়িয়ে থাকবে, এক পা-ও এগোতে পারবে না" (গণশক্তি ২৪-৫-০৪)।* তাহলে সিপিএম নেতারাই যখন বলছেন, তাঁরা সরকার পরিচালনায় এখন 'নীতিনির্ধারক শক্তি', তখন তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ীই এই সরকারে তাদের যোগ দেওয়াটাই সকলে স্বাভাবিক ধরে নেবে। অথচ তাঁরা তা করেননি। এর জবাব দিতে গিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস একটা অদ্ভুত হাস্যকর যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *"বামফ্রন্ট তার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে কোথাও বলেনি যে, আমরা কেন্দ্রে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগ দেব। তা যখন বলেনি, তখন নির্বাচনের পরে যোগ দিলে মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হত না কি?" (গণশক্তি ২-৬-০৪)।* এটাই যদি তাঁদের বক্তব্য হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কংগ্রেস সরকার গঠন করলে তাকে সিপিএম সমর্থন দেবে — একথাও কি সিপিএম ভোটারদের বলেছিল? যদি না বলে থাকে, তাহলে এখন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দেওয়াও একইভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নয় কি?

যাই হোক, এবারের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের রাজনৈতিক অবস্থান কী ছিল, তা প্রথমে দেখে নেওয়া যাক। বিজেপি ও কংগ্রেসের বাইরের দলগুলিকে নিয়ে একটা তৃতীয় জোট তৈরি করা হোক — এটা এবার মুলায়ম সিং ও শরদ পাওয়ার চেয়েছিলেন, আবার সিপিএম ফ্রন্টের শরিক আরএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লকেরও এই একই প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সিপিএম তা চায়নি এবং বলেছে, বর্তমানে তৃতীয় জোট গড়ার বাস্তব অবস্থা দেশে নেই। অন্যদিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সকল বামপন্থী দলগুলোকে নিয়ে একটা বামপন্থী বিকল্প গড়ে তোলার চেষ্টাও সিপিএম করেনি। এবার ভোটের আগে সিপিএমের বক্তব্য ছিল, বিজেপি'র মতো একটি চরম সাম্প্রদায়িক শক্তি সরকারে বসায় পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, বিজেপি ও কংগ্রেসের সাথে সমদূরত্ব বজায় রাখার যেকথা একদা সিপিএম বলেছে, তা এখন আর খাটে না। এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিজেপিকে পরাস্ত করে কেন্দ্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করার জন্য সমস্ত অসম্প্রদায়িক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং বিশেষভাবে দেখা যাতে বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ না হয়। এ প্রসঙ্গেই তাদের সুবিধা হবে বলে কংগ্রেসকে বিরাট সার্টিফিকেট দিয়ে তারা বলেছে, দেশে অ-সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির মধ্যে কংগ্রেসই হচ্ছে সর্ববৃহৎ।

ভোট এগিয়ে আসতেই সিপিএম ঘোষণা করেছিল, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালা বাদ দিয়ে যেখানে যে দল বিজেপি'কে হারাতে পারে, সেখানে সেই দলকে ভোট দেওয়ার জন্য সিপিএম বলবে। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মধ্যে 'সর্ববৃহৎ কংগ্রেসও' রয়েছে, ফলে কংগ্রেসকেও ভোট দেওয়ার জন্য তারা জনগণকে আবেদন জানাবে। কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি সিপিএম। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাব — এই তিন রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম আসন সমঝোতা পর্যন্ত গড়ে তুলেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী দল রাষ্ট্রীয় তেলেঙ্গানা সমিতির তোলা পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরির দাবি মেনে নিয়েই কংগ্রেস ঐ দলটির সাথে নির্বাচনী মোর্চা করার পরও কংগ্রেস-টিআরএস জোটের সাথে আসন সমঝোতা করতে সিপিএমের আটকায়নি। এই সমঝোতার সুবাদেই এবার সিপিএম তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বেশ কয়েকটি লোকসভা আসন পেয়েছে। শুধু কী আসন সমঝোতা? তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাবে সিপিএমের প্রার্থীরা এবার সনিয়া গান্ধীর ও কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 'হাত'-এর ছবি নিয়ে প্রচার করেছেন, তাঁদের দলের কার্যালয়ে সনিয়া গান্ধীর ছবি ও বাণী টাঙানো হয়েছে, 'হাত' চিহ্নের মধ্যে সিপিএমের প্রতীক কাস্তে হাতুড়ি ছাপিয়ে সিপিএম প্রচার করেছে। এই ধরনের প্রচার চালিয়ে সিপিএম জনগণকে কি একথাই বোঝাতে চায়নি যে, লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া, অর্থাৎ কংগ্রেস ও সিপিএম একই জোটভুক্ত? এঘটনার পরও সিপিএমের তাত্ত্বিক নেতা প্রকাশ কারাত যখন *গণশক্তিতে (২৮-৫-০৪) লেখেন "এই নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা তৈরির প্রশ্নটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি খারিজ করে দিয়েছিল"* — তখন তাকে সত্যবাদিতা বলা যায় না।

এই পশ্চিমবঙ্গেও সিপিএম নেতারা ভোটের প্রচারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে অনেক গরম কথা বলেছেন, কিন্তু সাংবাদিকরা যখন সরাসরি প্রশ্ন রেখেছেন, ভোটের পর তাঁরা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সাথে যৌথভাবে সরকারে যাবেন কিনা, কোনও সিপিএম নেতাই জবাবে স্পষ্ট 'না' বলেননি। কেউ বলেছেন, ভোটের ফল বেরোবার পর দেখা যাবে, কেউ বলেছেন, কংগ্রেসের কর্মসূচি দেখেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আবার কোন কোন নেতা এমনও বলেছেন, কংগ্রেসের সাথে কর্মসূচিগত ঐক্য হলে সরকারে যেতেও সিপিএমের আপত্তি নেই। জ্যোতি বসু-হরকিষেণ সিং সুরজিৎরা এবার বেশ গর্বের সাথে একথাও বলেছেন, সনিয়া গান্ধী 'একলা চলবার' নীতি ত্যাগ করে জোট রাজনীতির পথে এসেছেন সিপিএমের পরামর্শ শুনেই। এবং ঘটনা হল ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে থেকে সরকার গঠন পর্যন্ত এবং তারপরেও কংগ্রেসের বিশেষত সনিয়া গান্ধীর ফ্রেন্ড, ফিলজফার এ্যান্ড্ গাইড-এর ভূমিকা নিয়েছে সিপিএম। এরপরও সিপিএম নেতারা যখন বলেন, কংগ্রেসের সাথে মৌলিক নীতিগত পার্থক্যের জন্যই তাঁরা সরকারে যাননি, তখন সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাস লিখেছেন, *"কংগ্রেস দল সম্পর্কে আমরা বরাবর বলে আসছি যে, তারা বৃহৎ পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীর স্বার্থ রক্ষা করে চলে। বিজেপি জোট সরকারের আনা প্রতিটি জনবিরোধী বিল, যেমন বিদ্যুৎ বিল, বীমা বিল, পেটেন্ট বিল কংগ্রেস সমর্থন করেছে। অর্থাৎ, আর্থিক নীতির প্রশ্নে কংগ্রেস, বিজেপির মধ্যে কার্যত কোনও তফাৎ নেই" (গণশক্তি, ঐ)।* কংগ্রেস 'বুর্জোয়া-জমিদারদের দল' এই জাতীয় কথাবার্তা নিজেদের সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রয়োজনে বহুকাল পর হঠাৎ করে আবার সিপিএম নেতাদের মুখে শোনা গেল। দীর্ঘদিন এসব কথা তাঁরা বলেননি। এসব কথাবার্তায় কি সিপিএম নেতাদের নিজেদেরই কোনও বিশ্বাস আছে? কখনও কংগ্রেস, কখনও জনসংঘ সমেত জনতা পার্টি, আবার কখনও বিজেপি কী চরণসিং, না হয় ভি পি সিং, এভাবে প্রায় সকল বুর্জোয়া দল ও গোষ্ঠীর সাথে যখন তখন নিকৃষ্ট সুবিধাবাদী আঁতাতকে "কৌশল" বলে চালাতে চালাতে এই তথাকথিত কৌশলই যে বাস্তবে সিপিএমের মূল নীতিতে (স্ট্র্যাটেজি) পরিণত হয়েছে — এই সহজ সত্য ঘটনাটা সিপিএম নেতারা চাপা দেবেন কী করে? নাহলে যে বুর্জোয়া-জমিদারদের তাঁরা শ্রেণীশত্রু বলেন এবং যাদেরই তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে চান সেই 'বুর্জোয়া-জমিদারদের দল' কংগ্রেসের সাথে তাঁরা ভোটে আসন সমঝোতা করেন কোন্ নীতির ভিত্তিতে? সনিয়া গান্ধীর ছবি ও বাণী নিয়ে প্রচার চালান কী করে? সর্বোপরি, এহেন কংগ্রেস দলকে সরকারে বসাতে ও সেই সরকারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সমর্থন দেন কী করে? এসবই যদি তাঁরা করতে পেরে থাকেন, এক্ষেত্রে তাঁদের দলের মূল নীতির সাথে যদি বিরোধ না হয়ে থাকে, তাহলে শুধু ঐ সরকারে যোগ দিলেই তাঁদের মূল নীতি নষ্ট হবে একথা কি যুক্তিগ্রাহ্য?

কংগ্রেসের ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি নিয়েও সিপিএমের আচরণ কি খুব নীতিসম্মত? ভোটের সময় ওরা বলেছেন, কংগ্রেসের কর্মসূচি দেখেই সিপিএম তার অবস্থান ঠিক করবে। ভোটের ফল বেরোতেই দেখা গেল সিপিএম নেতা সুরজিৎ-এর বাড়ি ছুটে গেলেন একদিকে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী, অন্যদিকে ভারতের শীর্ষ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অন্যতম রিলায়েন্সের আম্বানি। এরপরই কংগ্রেসের সরকার যাতে গঠিত হয়, তা দেখার দায়িত্ব নিয়ে সুরজিৎ মাঠে নেমে পড়লেন।

১৭ মে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিএম যখন ঘোষণা করল যে কংগ্রেসের সরকারকে তারা সমর্থন দেবে, তখনও কিন্তু ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচির খসড়াও তৈরি হয়নি। এ ব্যাপারে সিপিএমের সাথে কংগ্রেসের কোনও কথা হয়েছে কী না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে সুরজিৎ বলেন, *"না, কোনও কথা হয়নি। আমাদের ইশতেহারেই রয়েছে আমরা কী চাই" (গণশক্তি ১৮-৫-০৪)।* অর্থাৎ সিপিএম নিশ্চিত ছিল যে, তাদের দলের ইশতেহার অনুযায়ীই কংগ্রেস জোট সরকারের অভিন্ন কর্মসূচি তৈরি হবে। এই কর্মসূচি ২৭ মে প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। এরপরই ৩ জুন দিল্লিতে দলের বিজয়ী সাংসদদের এক সম্বর্ধনা সভায় সুরজিৎ বলেন, *"আমরা কেন্দ্রের যে অভিন্ন কর্মসূচি তৈরি হয়েছে, তা অনুমোদন করেছি। কৃষক মজদুরদের সমস্যা নিয়ে পুঁজিবাদী দলকে এভাবে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে আগে কখনও দেখা যায়নি। তাই যে কর্মসূচি তৈরি হয়েছে, তা যাতে রূপায়িত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পাহারাদারের ভূমিকা নিতে হবে বামপন্থীদের।" (গণশক্তি ৪-৬-০৪)।* শুধু পাহারাদারের ভূমিকা কেন? যে কর্মসূচি তাঁরা নিজেরাই বলছেন সিপিএমের ইশতেহার দেখেই তৈরি হয়েছে; একটি পুঁজিবাদী দল হয়েও কংগ্রেসের যে কর্মসূচিতে কৃষক মজদুরদের সমস্যার কথা বলা হয়েছে বলে তাঁরাই বলছেন এবং সোজাসুজি না বললেও সিপিএম যখন বোঝাতে চেয়েছে যে, তাদের ভূমিকার ফলেই এমন কর্মসূচি গ্রহণ করানো সম্ভব হয়েছে, তখন সেই কর্মসূচিতে কেন সিপিএম স্বাক্ষর করবে না? কেন তা রূপায়ণ করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব সিপিএম নেবে না? কোন দায়িত্বশীল পার্টি কি এধরনের আচরণ করতে পারে?

লাগাতার প্রবল গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনের পর ১৪ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সুযোগ যখন এসেছিল, এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সেই সরকারে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসাবে বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের বুর্জোয়া সরকার যেভাবে জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে দমন করেছে, বামপন্থীরা সরকারে গিয়ে তা করতে পারে না। অতএব এই সরকার নীতি হিসাবে "ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না" গ্রহণ করলেই একমাত্র এস ইউ সি আই এই সরকারে যোগ দেবে। অনেক বিরোধিতার পর শেষপর্যন্ত সিপিএম এই শর্ত

সাতের পাতায় দেখুন

শহীদ যতীন দাস বলেছিলেন —

‘আমার প্রাণ দান যেন দেশের মানুষকে বাঁচার প্রেরণা যোগায়’

‘‘এ মরণ তো সহজ নহে, সম্মুখ সমরে প্রাণদান করা সহজ, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা সহজ, বিষপান করিয়া দেহত্যাগ করা সহজ, ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করা সহজ, কিন্তু দিনের পর দিন অনাহারে থাকিয়া তিলে তিলে দেহকে স্বেচ্ছায় জীবনশূন্য করা জগতে অসাধারণ ব্যাপার’’ — বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুর পর সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত এই শ্রদ্ধার্ঘ আজও নিমেষে আমাদের সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে দিয়ে যায়। বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী যতীন দাস কারাগারে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে ও রাজবন্দীদের উপযুক্ত মর্যাদার দাবিতে ১৯২৯ সালের ১৩ জুলাই অনশন শুরু করেন। এই অনশনে অংশ নিয়েছিলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্তের মতো বিপ্লবীরাও। যতীন দাস মনে করতেন, তাঁদের দাবি ব্রিটিশ শাসকরা মানবে না। কিন্তু আন্দোলনে নামলে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালাতে হবে, অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য জেনেই অনশন আন্দোলনে নামতে হবে। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা, এটা ছিল তাঁর প্রশ্ন। শেষপর্যন্ত যখন যতীন দাস অনশনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং জীবন দিয়েই তিনি অবিচল সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

এ বছরটি শহীদ যতীন দাসের জন্ম শতবর্ষ। গত ২৩ মার্চ কলকাতার মুক্তাঙ্গন মঞ্চে প্রবীণ বিপ্লবী প্রবোধরঞ্জন সেনকে সভাপতি করে ‘শহীদ যতীন দাস জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি’ গঠিত হয়। ১৩ জুলাই বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে কমিটির উদ্যোগে সকালে ‘যতীন দাস পার্কে’ অবস্থিত যতীন দাসের মূর্তিতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ যতীন দাসের মূর্তির সামনে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ‘যতীন দাস ব্রিগেড’ গঠনে উদ্যোগী কমিটির কিশোর-কিশোরীরা। এরপর নানা সংগঠন এবং মেট্রো রেলের যতীন দাস পার্ক স্টেশনের কর্মীবৃন্দ মাল্যদান করেন।

বিকাল ৫-৩০টায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় একটি সেমিনার। আলোচ্য বিষয় ছিল, ‘বর্তমান সমাজে শহীদ যতীন দাসের প্রাসঙ্গিকতা’। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ অধ্যাপক কাষ্টীশ মাইতি। সভায় ভিড় উপচে পড়ে। বক্তা হিসাবে যে প্রবীণ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, জনসমাগমে তাঁরা খুবই আশান্বিত বোধ করেন।

অন্যতম বক্তা ডঃ অমলেন্দু দে বলেন, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে শহীদ যতীন দাসকে ঘরে ঘরে স্মরণ করা হয়। পাঞ্জাবে শহীদ ভগৎ সিং ও যতীন দাসের জীবনী পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার লজ্জা যে, আমরা যতীন দাস সহ আপসহীন বিপ্লবীদের জীবনী পাঠ্যসূচিতে এখনও অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি।

সাংবাদিক গীতেশ শর্মা বলেন, এ কলকাতায় যতীন দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ সেই শহরে কত অত্যাচার, অনাচার অথচ তার বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ নেই যুব সমাজের মধ্যে। এখানেই বিপ্লবী যতীন দাসকে স্মরণ করার প্রাসঙ্গিকতা।

সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভাস রায়, অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অনিল মুখার্জী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নতুন করে লেখার দাবিকে সমর্থন জানান সকল বক্তাই। সেমিনারের অন্যতম বক্তা, সারা বাংলা শহীদ ক্ষুদিরাম জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক ও বিশিষ্ট জননেতা সৌমেন বসু তাঁর বক্তব্যে বলেন, ৬৩ দিন অনশনে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে হয় না। বিপ্লবী যতীন দাসের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি তৎকালীন সময়ের যে উচ্চ আদর্শ ও উন্নত নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছেন — তার থেকে আজকের প্রজন্মকে উপযুক্ত ও যুগোপযোগী শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ অতীতের সংগ্রামী চরিত্রগুলির নির্যাস গ্রহণ করে বর্তমান সমাজের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মনিয়োগের যে শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন, তাকে আত্মস্থ করতে হবে ছাত্র-যুব সমাজকে। তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে শহীদ যতীন দাসকে স্মরণ করার সার্থকতা। যতীন দাস স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, ‘আমার প্রাণদান যেন দেশের মানুষকে বাঁচার প্রেরণা যোগায়।’ তিনি ভাষা-ধর্ম-প্রাদেশিকতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বলেছিলেন, ‘আমি বাঙালী নহি, আমি ভারতবাসী। আমার মৃত্যুর পর গোঁড়া বাঙালী হিন্দু সমাজের প্রথা অনুসারে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের জন্য — আমার শবদেহ কালীবাড়িতে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই’। আজ সমস্যাদীর্ণ এদেশে তাঁর জীবন চর্চার যথার্থতা প্রাসঙ্গিক।

সভার শেষে অন্যতম যুগ্মসম্পাদক এস রায়চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্মেলন

গত ৮-৯ জুলাই প্রবল উৎসাহ- উদ্দীপনার সাথে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ৪র্থ কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ৮ জুলাই মৌলালি যুবকেন্দ্রে প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার বিভিন্ন এলাকার মা-বোনেরা। সকাল থেকে প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও হল ছিল পরিপূর্ণ। হলের প্রবেশপথে তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে একটি তোরণ।

সম্মেলনের কাজ শুরু হয় শহীদ প্রীতিলতার উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এই মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এই জি জয়লক্ষ্মী, রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী, কমরেড মেনকা বসুরায়, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়, কোষাধ্যক্ষা কমরেড কৃষ্ণা সেন এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী।

কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী বলেন, বিশ্বায়নের কুপ্রভাবে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। গণমাধ্যমে নগ্ন নারীদেহের প্রদর্শন, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা — এসবই এই পচাগলা সংস্কৃতিরই প্রতিফলন যার বলি হচ্ছেন গোটা মহিলা সমাজ। নানা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি জানান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মহিলারা এ আই এম এস এস-এর নেতৃত্বে কীভাবে এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছেন।

প্রধান বক্তা বিশিষ্ট জননেতা কমরেড মানিক মুখার্জী উপস্থিত মা-বোনেদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের সমাজে মেয়েদের লড়তে হচ্ছে দ্বিমুখী লড়াই। একদিকে দীর্ঘদিন ধরে পুরুষশাসিত সমাজের আধিপত্য, মধ্যযুগীয় নানান কুসংস্কার, অপরদিকে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সার্বিক সঙ্কট। মেয়েদের লড়াই পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, এই পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে। আপনারা সমাজের সম্পদ, আপনাদের সন্তানও সমাজেরই সম্পদ। তাই আপনাদের তৈরি হতে হবে তেমন ভাবে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করে নারীমুক্তি আসতে পারে না — তা স্বেচ্ছাচারিতা। তাই এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমেই পুরুষশাসিত সমাজের আধিপত্য, মনন, সংস্কার থেকে নারীদের মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

সম্মেলনের অন্যতম বক্তা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় বলেন, নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনের সাথে সাথে মদের ঢালাও লাইসেন্স ও মাধ্যমিক স্তরে ‘যৌনশিক্ষা’ চালু করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ আই এম এস এস যে আন্দোলন শুরু করেছে তাকে ব্যাপকতর করতে হবে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা কমরেড ভারতী রায়। সম্মেলন থেকে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া, আমলাশোল ও চা-শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু ও মহিলাদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশের প্রতিবাদে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৯ জুলাই প্রতিনিধি অধিবেশন হয় মহাবোধি সোসাইটি হলে। দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধি অধিবেশন থেকে কমরেড ভারতী রায়কে সভানেত্রী ও কমরেড প্রণতি করকে সম্পাদিকা করে আটচল্লিশ জনের কলকাতা জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন শেষ হয়।

হুগলিতে ছাত্র আন্দোলন

এ আই ডি এস ও-র হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলার স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির দাবিতে, ভর্তির সময় অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি ও ডোনেশন নেওয়ার ও কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে গরিব ছাত্রদের ঘাড়ে বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপানোর প্রতিবাদে ১৬ জুলাই হুগলি জেলার ডি এম-এর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে ডি এম অফিসের সামনে এলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে এ ডি এম এবং এ ডি আই ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন ও স্মারকলিপি নেন। তাঁরা স্কুলগুলি যাতে সরকারি নিয়ম মেনে চলে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে তার ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বন্যা-ভাঙন দুর্গতদের কথা কে শোনে?

বর্ষা শুরু হয়েছে, বন্যা-ভাঙন চলছে, নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে শত শত বাড়ি। জমিজমা, ঘরবাড়ি, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ। বন্যা-ভাঙনের এই সমস্যা আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, ফি বছর হচ্ছে। মালদা, মুর্শিদাবাদে বন্যা ভাঙন সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, অন্যান্য জেলার মানুষকেও এ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পথের ভিখারি হয়ে গেছে কত পরিবার। কিন্তু কে করবে এর প্রতিকার? কেন্দ্র বলে রাজ্যের দায়িত্ব, রাজ্য বলে কেন্দ্রের। কেন্দ্র রাজ্যে চাপান-উতোর চলছে। আর এদিকে গঙ্গাবক্ষে মানুষের কান্না ভাঙনের গর্জনে চাপা পড়ছে।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল

বর্ষা এলেই ভাঙনের কথা মনে পড়ে। কিছু টাকা মঞ্জুর হয়। কিছু বোল্ডার পড়ে নদীপাড়ে, যথারীতি তা তলিয়েও যায়। কন্ট্রাক্টররা লাভবান হয়। ভাঙন চলতেই থাকে। ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকরী কোন পরিকল্পনা আজও সরকারের নেই। তার চেয়েও বড় কথা কেন্দ্র ও রাজ্যের হৃদয়হীন শাসকেরা এ সমস্যার জন্য কোন উদ্বেগবোধ করে না। কেন্দ্রের সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকার উত্তরাঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত গঙ্গাভাঙন মোকাবিলায় মঞ্জুর করেছে মাত্র ৩০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির কথা — 'রাজ্য সরকার প্রকল্প না পাঠালে তাঁর মন্ত্রক গঙ্গা নিয়ে কিছু করতে পারবে না।'' আর সিপিএম নেতা সাংসদ নীলোৎপল বসু বলেন, 'একথা ভুল যে রাজ্য থেকেই প্রকল্প আসতে হবে।..... কেন্দ্র চাইলে নিজে থেকেই প্রকল্প বানিয়ে টাকা বরাদ্দ করতে পারে।'' কেন্দ্র ও রাজ্য এভাবে একে অপরের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে দায় খালাস করছে।

একদিকে ভাঙন, অন্যদিকে ভাঙন প্রতিরোধে কেন্দ্র রাজ্য উদাসীনতা — এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাঙন কবলিত মানুষের আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই লক্ষ্য ও কার্যক্রম নিয়েই সারা বাংলা বন্যা-ভাঙন ও খরা প্রতিরোধ কমিটি গত ৪ জুলাই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পিএলটি হলে একটি নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করেছিল। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী। বন্যা-ভাঙন দুর্গত জেলাগুলির মানুষেরা এসেছিলেন ঐ কনভেনশনে। বন্যা-ভাঙন-খরা বিধ্বস্ত মানুষগুলির জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন ঘোষাল বলেন, এই দুর্দশার প্রতিকারে দুর্গত মানুষের হাত ও হাতিয়ার হচ্ছে সংগঠন, যেটা গড়ে তুলতে পারলেই আন্দোলনের জোরে দাবি আদায় করা সম্ভব হবে। বন্যা ও ভাঙন নিয়ন্ত্রণের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও বিজ্ঞানসম্মত কার্যক্রম কী হতে পারে, তার রূপরেখা দেওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের কাছে আবেদন জানান এবং বলেন, ঐ রূপরেখাকে সামনে রেখেই আন্দোলন গড়ে উঠবে।

অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, কবি ও সাহিত্যিক তরুণ সান্যাল, ভূগোলবিদ মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গৌরীশঙ্কর ঘটক। সম্মেলনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শঙ্কর ঘোষ। আন্দোলনের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন সম্পাদকমণ্ডলীর অপর সদস্য ডঃ শুভাশিস মাইতি। বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধে আন্দোলনের প্রথম শহীদ নহিরুদ্দিন স্মরণে ১৭ জুলাই দিবসটি পালন করার ও সমস্যার প্রতিকারের দাবি জানিয়ে আগামী ১৬ আগস্ট কলকাতায় বন্যা-ভাঙন দুর্গত মানুষের মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

খেয়াপারাপার ও স্কুল উন্নয়নের দাবিতে

কুলতলীতে ছাত্র বিক্ষোভ

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র গোপালগঞ্জ স্কুল ইউনিটের পক্ষ থেকে গত ১২ জুলাই জামতলায় প্রায় ১১০০ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে বি ডি ও এবং এস আই-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোপালগঞ্জ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সমস্যা গোপালগঞ্জ-শানকিজাহান নবিপুকুর খেয়া পারাপার। নদীর দু'পারের জেটিই মাটিতে বসে যাওয়ায় প্রায় প্রতিদিন গোপালগঞ্জ বি কে আর এস ইনস্টিটিউশনের ৭০০ ছাত্রছাত্রীকে হাঁটুভর কাদা মাড়িয়ে স্কুলে যেতে হয়। এভাবে যেতে গিয়ে তাদের বইখাতা, জামা-কাপড় নষ্ট হয়। ভিজে জামাকাপড়ে সারাদিন ক্লাস করতে হয়। এই অঞ্চলের একমাত্র হাট — কলোনির মন্মথ অধিকারীর হাটে প্রায় ৪০০০/৫০০০ মানুষ এবং কলোনির ৩০০০ রেশন কার্ড হোল্ডার প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন তেল নেওয়ার জন্য ঐ খেয়াঘাট পারাপার করেন যার মধ্যে বহুসংখ্যক মহিলা। এই সমস্যাগুলিসহ গোপালগঞ্জ হাইস্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে বি ডি ও'র কাছে ২০০০ মানুষের স্বাক্ষর সহ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শানকি-জাহান কলোনির প্রাইমারি স্কুলবাড়িটি এতই জরাজীর্ণ যে শিশুরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে গাছতলায় ক্লাস করতে বাধ্য হয়, আর বর্ষায় বসার কোন জায়গা নেই।

বি ডি ও খেয়াপারাপারের জন্য জেটি নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করবেন এবং এস আই স্কুল বাড়িটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করবেন বলে আশ্বাস দেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তা কুলতলীতে পূর্ণাঙ্গ কলেজ স্থাপন, জুনিয়ার হাই স্কুলকে হাইস্কুলে এবং হাইস্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার জন্য যে আন্দোলন চলছে তাকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

১২ জুলাই জামতলায় বি ডি ও এবং এস আই-এর কাছে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা

জেলায় জেলায় ডি ওয়াই ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত

সকল বেকারের কাজ অথবা উপযুক্ত বেকারভাতা ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের পরিবর্তে শ্রমনির্ভর শিল্পস্থাপনের দাবিতে, মদের ঢালাও লাইসেন্স ও অপসংস্কৃতি প্রসারের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রতিরোধে ডি ওয়াই ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে জেলায় জেলায় সপ্তাহব্যাপী (২৬ জুন — ২ জুলাই) কর্মসূচি পালিত হয়।

দার্জিলিং ঃ প্রতিষ্ঠা দিবস ২৬ জুন সকালে শিলিগুড়িতে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও যুবসভার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়িতে এক যুবসভার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড জীবন সরকার, বিজয় লোধ প্রমুখ। বিকালে মার্চেন্ট রোড, রায়গঞ্জ, ধূপগুড়িতে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোচবিহার ঃ কোচবিহার শহর, দিনহাটা, মাথাভাঙা ও হলদিবাড়ীতে অনুষ্ঠিত পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ নাজমা খন্দকার, প্রভাত রায়, বিমান দাস প্রমুখ।

উত্তর দিনাজপুর ঃ ২৯ জুন রায়গঞ্জে মোহনবাটি রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড বিপ্লব সরকার ও রঞ্জন কর্মকার। সভায় নারীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যুবক পুলক করের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুমারগঞ্জ থানার আমুলিয়ায় যুবসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড বীরেন মাহাত। বালুরঘাট সংলগ্ন ভাটপাড়ায় ও তপন থানার মণিপুর স্কুলেও যুবসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতেই বক্তব্য রাখেন কমরেড নন্দা সাহা।

মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুর, রানিনগর, লালবাগ, ইসলামপুর, ডোমকল, সাগরদীঘি, সূতি, হরিহরপাড়া, ভগবানগোলা, জলঙ্গী প্রভৃতি ১০টি ব্লকে পথসভা, যুবসভা, বিক্ষোভ মিছিল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এইসব কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ মোসাব্বর হোসেন, কৌশিক চ্যাটার্জী, সামসুল আলম, ইনসার আলি, শিউলী আহমেদ, শেখর সোনার প্রমুখ।

হুগলি ঃ শেওড়াফুলি সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনে এক যুবসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, রিষড়া, কোন্নগর, বলরামবাটি, কামারকুণ্ডু, মধুসূদনপুর এলাকা থেকে যুবকযুবতীরা যোগ দেন। সভা পরিচালনা করেন স্থানীয় শিক্ষক পঞ্চানন খাঁ। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড দীপক ব্যানার্জী।

বীরভূম ঃ ২৭ জুন শতাধিক যুবকযুবতীর উপস্থিতিতে সিউড়ী নেতাজী স্কুলে যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন কমরেড মদন ঘটক। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড মানস সিংহ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড নিতাই অক্রুর ও অন্যান্যরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ জুন মাস জুড়ে হেড়োভাঙা, জামতলা, প্রিয়র মোড়, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর, মন্দিরবাজার, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, মনিরতট, ঘটিহারানিয়া সহ বহু জায়গায় যুবসভা সংগঠিত করা হয়। ২৬ জুন কাকদ্বীপ, নামখানা, জামতলা, জয়নগর ইত্যাদি জায়গায় কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচি পালন করা হয়। যুব সমাবেশগুলিতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী, স্বপন দেবনাথ, শ্যামল প্রামাণিক, আনসার শেখ, দিব্যেন্দু মুখার্জী প্রমুখ।

পুরুলিয়া ঃ ১ জুলাই পুরুলিয়া শহরে যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড প্রবীর মাহাতো, বক্তব্য রাখেন কমরেড স্বপন দেবনাথ।

কলকাতা ঃ ২৬ জুন হাজরায় পথসভা ও ২৯ জুন এসপ্লানেড মেট্রোর সামনে দুই শতাধিক যুবকযুবতীর অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুরথ সরকার। বক্তব্য রাখেন কমরেড নিরঞ্জন নস্কর ও অন্যান্য বক্তারা।

এছাড়াও বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

সিপিএম যোগ দিল না কেন ঃ নীতির কথা লোকঠকানো বুলি মাত্র

চারের পাতার পর

মেনে নেওয়ায় এস ইউ সি আই যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ দিয়েছিল। এস ইউ সি আই সেদিন সিপিএমের মতো চাষী-মজুরের কথা মুখে বলব, অথচ সুযোগ এলে তাদের স্বার্থে কাজ করার দায়িত্ব এড়িয়ে যাব — এই সুবিধাবাদী রাস্তা নেয়নি। বরং এস ইউ সি আই-এর চাপে যে নীতি যুক্তফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, সরকারে যোগ দিয়ে সেই নীতিকে গণআন্দোলনের স্বার্থে কার্যকরী করাও এস ইউ সি আই নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছিল এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল।

এস ইউ সি আই নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, ''ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ যাবে না।'' অর্থাৎ মুখে যা বলা হয়েছিল, সুযোগ দেখা দেওয়ায় তা বাস্তবে রূপায়ণ করার দায়িত্বও এস ইউ সি আই গ্রহণ করেছিল। যতদিন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রী ছিলেন, ততদিন তিনি এই নীতি বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

এবার কেন্দ্রের সরকারে সিপিএমকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক দেওয়ার প্রস্তাব কংগ্রেস দিয়েছিল। পছন্দসই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক গ্রহণ করে সিপিএম অভিন্ন কর্মসূচি মেনেই দেখিয়ে দিতে পারত যে, কীভাবে কৃষক মজুরদের স্বার্থে কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হয়। ভোটের সময় সিপিএম জনগণকে বলেছিল, সংসদে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করা দরকার যাতে সরকারি নীতির অভিমুখ গরিব মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। যেভাবেই হোক, লোকসভায় সিপিএম ও তার সহযোগীদের শক্তি বেড়েছে শুধু নয়, তাদের সমর্থনের উপরই কংগ্রেস সরকার দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে প্রতিশ্রুতিমত সরকারি নীতির অভিমুখ গরিব মেহনতি মানুষের স্বার্থের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজটি তারা করতে পারত। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তারা ভূমিকা নিতে পারত। তারা সেটা করল না। এর দ্বারা তাদেরই দেওয়া প্রতিশ্রুতি কি তারা নিজেরাই লঙ্ঘন করল না? তাদের প্রতিশ্রুতি শুনে যে জনগণ তাদের ভোট দিল, সেই জনগণের প্রতি, সিপিএমের নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ীই, বিশ্বাসঘাতকতা করা হল না কি?

সিপিএম নেতারা বলেছেন, কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকার যদি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়, তবে সিপিএম তার বিরোধিতা করবে। অন্যদিকে সেই সিপিএম নেতারাই বলছেন, বিজেপি'র মতো ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক শক্তি যাতে পিছনের দরজা দিয়ে আবার ফিরে আসতে না পারে, সেদিকে সিপিএম কড়া নজর রাখবে, কংগ্রেস সরকারকে ফেলে দেওয়ার যেকোন চেষ্টাকে তারা রুখবে। যেজন্য কংগ্রেস সরকারকে পাঁচবছর ক্ষমতায় রাখার গ্যারান্টি দিয়েছে সিপিএম। কী অদ্ভুত স্ববিরোধিতা!

কংগ্রেস সরকারকে যেভাবেই হোক সরকারে রাখতে হবে — এই লাইনটাই যদি সিপিএমের আন্তরিক হয় তাহলে কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের কার্যকরী বিরোধিতা করা যায় না। অন্যদিকে, যদি ''জনস্বার্থে কংগ্রেসের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরোধিতা করার'' কথাগুলো নিছক লোকদেখানো বুলি না হয়, তাহলে কংগ্রেস সরকার যতই জনস্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ করুক, তাকে পাঁচ বছর টিকিয়ে রাখার কথা বলাটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। একথা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, কংগ্রেসকে যদি তার সরকারের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে না নয়, সিপিএম যদি তার অস্তিত্বের গ্যারান্টার হয়, তবে কংগ্রেসের আর ভয় কীসের? তারা বেপরোয়া চুরি, দুর্নীতি চালিয়ে যাবে, যেমন খুশি জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপ নিয়ে যাবে, যেটা পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও বাজেটের ক্ষেত্রেই দেখা গেল।

কেন সিপিএম নেতৃত্বকে জেনে বুঝে এমন হাস্যকরভাবে স্ববিরোধী অবস্থান নিতে হচ্ছে? বোঝাই যায় এখানে তাদের একটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কাজ করছে। শ্রেণী রাজনীতির বিচারে এটা ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করার বাধ্যতা — বাধ্য সেবাদাসের মত যে দায়িত্ব পালন করার বিনিময়েই সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতায় টানা ২৭ বছর থাকতে পারছে। অথচ, বিগত '৬৭ ও '৬৯ সালের সরকারকে একবার মাত্র ৯ মাস ও একবার ১৩ মাসের বেশি বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় টিকতে দেয়নি, ষড়যন্ত্র করে ফেলে দিয়েছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার এই বাধ্যবাধকতাই সিপিএম-কে বাধ্য করেছে কংগ্রেসের সমর্থনে দাঁড়াতে। এটা জানাই ছিল, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দল হিসাবে বিজেপি কেন্দ্রের সরকারে বসে যা যা করেছে, কংগ্রেসও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বস্ত দল হিসাবে সেটাই করবে। বাস্তবে বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সামনে সমস্যাটা কী ছিল? পরম বিশ্বস্ততার সাথে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সেবা করা সত্ত্বেও কেন বিজেপি-কে সরে যেতে হল? বুর্জোয়াশ্রেণীরই দুই দলকে পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় বসিয়ে বুর্জোয়া শাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিকল্পিত যে দ্বিদলীয় রাজনীতি, যে বিষয়ে আমরা গণদাবীতে ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি, সেই দ্বিদলীয় রাজনীতির পরিকল্পনা মতই বিজেপিকে সরতে হল এবং কংগ্রেস এল। বিজেপি'র শাসনে পুঁজিবাদী 'নয়া আর্থিক সংস্কার নীতি' সারা দেশের জনজীবনে চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে জনমনে যে প্রবল বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, বিজেপি উগ্র হিন্দুত্ববাদের দ্বারা জনমনকে আচ্ছন্ন করে তাকে ধামাচাপা দিতে পারেনি, জনগণকে বিভ্রান্ত করতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণী এখন বিজেপি'র পরিবর্তে কংগ্রেসকে দিয়ে চূড়ান্ত জনবিরোধী সেই আর্থিক নীতিকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তবে এমন কায়দায় করাতে চায় যাতে মনে হয়, যেন জনসমর্থনের ভিত্তিতেই কংগ্রেস এগুলো করছে, এবং কাজগুলোও হচ্ছে যেন জনস্বার্থেই। এই মতলব থেকেই আর্থিক সংস্কারের 'মানবিক মুখ' এই আওয়াজ তোলা হয়েছে এবং এখানেই বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে সিপিএমের মতো বামপন্থীদের প্রয়োজনীয়তা। গরিব-মধ্যবিত্তের স্বার্থ ও বামপন্থা — এই দুটো প্রায় সমার্থক জনসাধারণের চোখে। কোনও সরকারে বামপন্থী দল আছে একথা জানলে আজও মানুষ ধরে নেয় যে, সেই সরকার নিশ্চয়ই জনগণের স্বার্থে কাজ করবে। বামপন্থী নাম নিয়েও, মুখে বামপন্থা, গরিবের স্বার্থ রক্ষার স্লোগান ও হাতে লাল ঝাণ্ডা নিয়েও যে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা যায়, বহু দেশের ইতিহাসে এমন নজির যে অনেক আছে এবং আমাদের দেশেও সিপিএম ও সিপিআই-এর মতো তথাকথিত 'বামপন্থী' 'মার্কসবাদী' দলগুলির ভূমিকাও যে তেমনই, এ সত্যটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকলেও এখনও গোটা দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। আজও অনেকেই মনে করে, সিপিএম যথার্থই গরিব মধ্যবিত্তের দল, তাদের স্বার্থে লড়াই করে। ফলে কেন্দ্রের যে সরকারের সাথে সিপিএম আছে, সেই সরকারকে গরিব মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার বলে জনগণের সামনে হাজির করাটা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে কিছুটা সহজ। এ কারণেই ভারতের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী চেয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের পাশে সিপিএম দাঁড়াক, এই সরকারকে প্রগতিশীল বলে প্রচার করুক। সিপিএম সেটাই করছে।

আবার একথাও সত্য, যে 'বামপন্থী' ভাবমূর্তির মুখোশ পরে সিপিএম গরিব মধ্যবিত্তের 'দরদী'র ভাণ করতে পারছে, যার জোরেই নিজের শক্তি ও সমর্থন সে বাড়িয়েছে, সেই বামপন্থী মুখোশটি খসে যাক, নেতৃত্বের আসল চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ুক, সিপিএম নেতৃত্ব তা কিছুতেই চাইবে না। অন্যদিকে যে বুর্জোয়াশ্রেণী সিপিএমের সার্ভিস পাচ্ছে, তারাও বা সেটা চাইবে কেন? এখানে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া আছে। সুতরাং, সিপিএম নেতৃত্ব কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে কার্যত নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েও সরকারে যে গেল না, সেটা নিজের দলের মধ্যে যে অংশটা আজও বামপন্থী নীতি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁদের কাছে ও সারা দেশের জনগণের কাছে নিজের বামপন্থী ভাবমূর্তির মুখোশটা বজায় রাখার জন্যই। লোকসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় বাজেটকে যখন সমর্থন জানাচ্ছেন সিপিএম সাংসদরা, সুরজিৎ গিয়ে সনিয়া গান্ধীকে যখন আশ্বস্ত করছেন, তখনই মাঠে-ময়দানে সিটুকে দিয়ে যে বাজেটের বিরুদ্ধে গরম ভাষণ দেওয়ানো হচ্ছে, সেটা ঐ বামপন্থী মুখোশ ধরে রাখার জন্যই। কংগ্রেস যদি জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হয়, যা হবেই এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনরোষের সম্মুখীন হয়, তখন এই সিপিএম নেতৃত্বই জনগণকে বলবে, 'দেখ, আমরা কংগ্রেসের সাথে একত্রে ঘর করেছি ঠিকই, কিন্তু ওদের হেঁসেলে অর্থাৎ মন্ত্রীসভায় ঢুকিনি, এবং এভাবেই আমরা (সিপিএম) নিজেদের ''বামপন্থী জাত'' রক্ষা করেছি, তা নষ্ট হতে দিইনি।' অতএব, 'কংগ্রেসের সাথে সিপিএমকে এক পংক্তিতে বসানো চলবে না' — এই আওয়াজ তুলে আবার কংগ্রেসবিরোধী সেজে সিপিএম জনগণের ভোট চাইবে। বস্তুত, কংগ্রেসের সাথে একত্রে ঘর করেও তাদের হেঁসেলে না ঢোকার এই রাজনৈতিক কৌশলটি নেওয়ার ক্ষেত্রে কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার আগামী বিধানসভা নির্বাচনটাও যে সিপিএমের হিসাবের মধ্যেই রয়েছে, এটা বোঝা দুঃসাধ্য কিছু নয়।

ফলে, কংগ্রেসকে সমর্থন করেও মন্ত্রীসভায় যোগ না দেওয়ার পিছনে নীতি, আদর্শ, বামপন্থা, শ্রেণী বিশ্লেষণ ইত্যাদি যেসব কথা সিপিএম নেতারা বলছেন, তা লোক ঠকানো বুলিমাত্র।

ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে

রঘুনাথপুরে এম এস এস-এর থানা অবরোধ

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের কাছেই নতুনডি গ্রামে স্বামী পরিত্যক্তা কাজল বাউরি তাঁর বৃদ্ধা মা এবং ৪ বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে বাস করেন। পাতা কুড়িয়ে বিক্রি, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে মজুরের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে কোনমতে তিনি সংসার চালান। অভিযোগে প্রকাশ, গত ২৭ জুন গভীর রাতে নতুনডি গ্রামের সিপিএম কর্মী নিখিল বাউরি, মিহির বাউরি, নারায়ণ বাউরি, পঞ্চানন বাউরি, টিঙ্কু বাউরি এবং জিতেন বাউরি কাজলের বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধা মায়ের সামনেই তাঁকে ধর্ষণ করে। বৃদ্ধা মা বাধা দিতে গেলে মুখে কাপড় বেঁধে তাঁকেও মারধর করে। চলে যাওয়ার সময় তারা শাসিয়ে যায়, একথা কাউকে জানালে খুন করা হবে। এই শাসানিকে অগ্রাহ্য করে, পরের দিন সকালেই ঐ মহিলা ঘটনাটি প্রতিবেশীদের জানান। তারা সিপিএম পঞ্চায়েত প্রধানকে বিষয়টা জানালে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে ধর্ষিতা মেয়েটিকে ভয় দেখানো হয়। এস ইউ সি আই কর্মী ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কমরেড চণ্ডী কৈবর্ত্য ঘটনাটি জানার সাথে সাথে কাজলকে রঘুনাথপুর থানাতে নিয়ে গিয়ে ওসি-কে বিষয়টা জানান। ঘটনাটি জানাজানি হওয়াতেই সিপিএমের লোকজন ভয় দেখিয়ে অসহায় মেয়েটিকে বাড়ি ছাড়া করে। কোন উপায় না দেখে মা ও শিশু সন্তানকে নিয়ে তিনি রঘুনাথপুরে আত্মগোপন করেন। এদিকে সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য এবং নেতারা থানাতে গিয়ে ওসি-কে এই কেসটি চাপা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। পুলিশ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় গত ১১ জুলাই মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন রঘুনাথপুর থানা ঘেরাও ও রাস্তা অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অবরোধ চলাকালীন রঘুনাথপুরের পূর্বতন বিধায়ক এস ইউ সি আই নেতা কমরেড বিজয় বাউরি থানায় গিয়ে ওসি'কে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। কয়েক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর বাধ্য হয়ে ওসি জনসমক্ষে প্রতিশ্রুতি দেন যে, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হবে। সিআই এবং ওসি'র সঙ্গে আলোচনায় নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রণতি ভট্টাচার্য, সুনীতি ভট্টাচার্য, কালিদাসী কিত, অনিতা মাহাতো প্রমুখ এম এস এস নেত্রীবৃন্দ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। ঐদিনই ধর্ষিতা মহিলার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

এই শিশুমৃত্যু মর্মান্তিক

একের পাতার পর

এখন নেতা ও মন্ত্রীরা অনেকেই অকুস্থলে ছুটে যাবেন, চোখের জল ফেলবেন, কিছু ক্ষতিপূরণও ঘোষণা করবেন, কাগজে ছবি প্রচারিত হবে। কিন্তু আলোড়ন থেমে গেলেই আবার সব ভুলে যাবেন, এটাই রেওয়াজ। গত জানুয়ারি মাসেই চেন্নাইতে শ্রীরঙ্গম নামে একটি ভাড়া দেওয়া বিয়ে বাড়িতে আগুন লাগলে ৫০ জনের মৃত্যুর পর সরকার আদেশ দিয়েছিল, এই ধরনের সকল পাবলিক বিল্ডিংস-এ বাধ্যতামূলকভাবে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। ব্যস্ ওটুকুই। বাস্তবে তা কার্যকর হল কিনা, তা দেখার দায়িত্ব যেন সরকারের নয়। এ অবস্থা কেবল তামিলনাড়ুতেই নয়, প্রায় সকল রাজ্যেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য এই ভেবে আশ্বস্তবোধ করতে পারে যে, এ রাজ্যে বিরাট সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ দূরের কথা, ঘরই নেই, ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম। শিশু ও ছাত্রদের বলা হয় দেশের ভবিষ্যৎ। যে দেশ তাদের জীবন নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারে, সেই দেশের ভবিষ্যৎ তাহলে কত ভয়ঙ্কর।

শিশুছাত্রদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ২১ জুলাই অন্যান্য রাজ্যে ও ২২ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে শোক দিবস পালন করে।

আসাম ও বিহারের বন্যা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্বেগ

বন্যা দুর্গত আসাম এবং বিহারের সর্বশেষ ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৬ জুলাই এক বিবৃতিতে, প্রতি বছর জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিধ্বংসী বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে দায়ী করেছেন।

কমরেড নীহার মুখার্জী দাবি জানিয়েছেন — এবার বিহারে ও আসামে বন্যা যে তীব্র ও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, তাতে অবিলম্বে রাজ্য সরকারগুলিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রিলিফ ও উদ্ধারের কাজ শুরু করতে হবে; বন্যাদুর্গত রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পর্যাপ্ত অর্থসাহায্য করতে হবে এবং বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতির মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাষ্ট্রের স্বরূপই নগ্ন হল

একের পাতার পর

কেন ওঁরা প্রতিবাদের এই রূপ বেছে নিলেন? বাস্তবে নিজেরা নগ্ন হয়ে তাঁরা সরকার ও রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপকেই নগ্ন করে দিয়েছেন। দেশের মানুষের সুপ্ত বিবেক জাগানোর জন্য বোধহয় এর প্রয়োজন ছিল। মহিলাদের প্রতিবাদে নেতৃত্বকারী রমণীদেবী বলেছেন, ''বিনাবিচারে একের পর এক হত্যা ও নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদে সরকার কান দেয়নি। আমরা মনোরমার মা। বিচারবিভাগীয় তদন্তে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমরা দোষীদের বিচার চাই গণআদালতে।'' মায়েদের এই কান্না ও প্রতিবাদ আমরা কাশ্মীরে পাঞ্জাবে শুনেছি, শোনা যাবে আরও বহু রাজ্যে যেখানেই উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের নামে ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও নানা নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল এ্যাক্ট (১৯৫৮)' যার জোরে তারা যাকে খুশি হত্যা করতে পারে, সেজন্য কাউকে জবাব দিতে হয় না। কোনও বিচার হয় না। এই নৃশংস পুলিশি ও সামরিক অত্যাচারে জনগণের মানসিক বিচ্ছিন্নতাই যে পুষ্ট হয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকেই যে অত্যাচারিত জনগণকে আরও ঠেলে দেওয়া হয়েছে এ সত্য আজ প্রমাণিত।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম ইবোবি সিংহ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সামনে পড়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে বলেছেন, 'মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার নাম করে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে মাঝে মাঝেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটায়। .....এর আগেও আমি বিধানসভাতেও স্বীকার করেছি, এ রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনী অনেকগুলি ভুয়ো সংঘর্ষের খবর প্রচার করেছিল, তাতে প্রায় ২০-২২ জন যুবককে হত্যা করা হয়েছে। এসব চলতে পারেনা।'' (আনন্দবাজার ১৭-৭-০৪)

মুখ্যমন্ত্রীর মুখের এই কথার সাথে যদি কাজের মিল থাকত, তবে আজ মায়েদের এভাবে প্রতিবাদে নামতে হত না। গণবিক্ষোভের উত্তাল জোয়ারের প্রবল চাপই মুখ্যমন্ত্রীকে একথা বলিয়েছে, যা বিক্ষোভ স্তিমিত হলেই তিনি ভুলে যাবেন। একথা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে, আমরা আশা করব, মণিপুরের জনগণ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে অবিচল থাকবেন।

বাঁকুড়া ছাত্র আন্দোলনের জয়

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা হাইস্কুলে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি ছাড়াও বাড়তি ফি ও ছাত্রপ্রতি ১০০ টাকা ডোনেশন সহ কলা বিভাগে সর্বসমেত ৩৯০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৪০৮ টাকা নিয়ে ভর্তি শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রধান শিক্ষককে স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র দিতে গেলে প্রধান শিক্ষক তা না নেওয়ায় ২ জুলাই এ আই ডি এস ও'র ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিন ডি ওয়াই এফ আই এবং এস এফ আই পুলিশকে কাজে লাগিয়ে ধর্মঘট ভাঙার অপচেষ্টা করে ও পুলিশ তিনজন ছাত্রকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। অবশেষে দেড় শতাধিক ছাত্র থানায় বিক্ষোভ-অবস্থান করলে পুলিশ ঐ ছাত্রকর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর ছাত্রছাত্রীরা ওন্দার রাস্তায় মিছিল করে এবং বিডিও-কে ডেপুটেশন দেয়। ছাত্র ধর্মঘটের রায় না মানলে ৬ জুলাই থেকে ছাত্র অনশনের ডাক দেওয়া হয়। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৫ জুলাই ডি এস ও'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেন যে আপাতত ডোনেশন নেওয়া বা ভর্তি স্থগিত থাকছে। ৯ জুলাই অভিভাবক মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত হবে। ঐ মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, — (১) শ্রেণীকক্ষে বিদ্যুৎ সরবরাহ মার্চ মাসের মধ্যে করা হবে। (২) লাইব্রেরিকে উপযুক্ত সংখ্যক বই সহ ঢেলে সাজানো হবে। (৩) বোর্ডের সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় ২১ টাকা করে নেওয়া হবে না যা এতদিন পর্যন্ত নেওয়া হত। (৪) ডোনেশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, দুঃস্থ ছাত্রদের ক্ষেত্রে ডোনেশন মকুব করা হবে। এই আন্দোলনের আংশিক জয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়।

পবিত্র সরকারের ভুয়া ডিগ্রি

তিনের পাতার পর

ব্যাপকহারে ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন প্রথা চালু, শিক্ষাকে ব্যবসায়ে পরিণত করার সরকারি হীন প্রচেষ্টার উগ্র প্রচারক হিসাবে সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, সিপিআই(এম)-এর প্রতি অনুগত এই ধরনের 'বুদ্ধিজীবী'দের কাজে লাগিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদগুলিকেও তারা দলীয় ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর কব্জায় রাখছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতই দেখা যায় পশ্চিমবাংলার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচনই হয় না — সর্বত্রই এস এফ আই ইউনিয়ন পায় বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায়! আসলে সিপিআই(এম)-এর বশম্বদ রেজিস্ট্রার বা রিটার্নিং অফিসাররা এস এফ আই ও পুলিশের যোগসাজসে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন সুযোগই দেয় না। মনোনয়নপত্র জমা দিতেই দেয় না — দিতে গেলেও তাকে গ্রহণ করে না বা গ্রহণ করলেও নানান অছিলায় তা বাতিল করে দেয়। যদি তা সত্ত্বেও কোথাও কেউ দাঁড়িয়ে যায় — তাহলে চলে নির্বিচার ভীতি প্রদর্শন ও হামলা। দলের বশম্বদ তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকদের একটা অংশ চক্ষুলজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে শাসকদলের মদতপুষ্ট হামলাকারীর সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায়। এর পুরস্কারস্বরূপ তারা পায় নানান উৎকোচ — হয় বিভাগীয় প্রমোশন, নইলে আরও উঁচু কোন পদ। বহুক্ষেত্রে আবার এভাবে প্রমোশন বা উৎকোচ পাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং তারজন্য কে কতটা সিপিআই(এম) দলের অনুগত তা প্রমাণ করবার হিড়িক পড়ে; চলে চাটুকারবৃত্তির অশোভন প্রতিযোগিতা। এসব মিলে পশ্চিমবাংলার শিক্ষার বাস্তব অবস্থা ভয়াবহ। দ্রুত শিক্ষার মান নামছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে সবার উপরে থাকা বাংলা আজ শিক্ষাক্ষেত্রে দেশে সপ্তদশ স্থানে। যেখানে একসময় শিক্ষক হিসাবে বিদ্যাসাগর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বসু ছিলেন — যাঁরা শুধু বিদ্যাদানেই নয় — জ্ঞানে, চরিত্রে, মনুষ্যত্বের সাধনায় ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতেন — আজ সেখানে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হচ্ছে ভুয়া ডিগ্রিধারী এবং শাসকদলের উৎকোচলোভী একশ্রেণীর মানুষ। ফলে দেশের মধ্যে চারিত্রিক মানেরও অবনমন ঘটছে। সমাজের অবক্ষয়কে আরও দ্রুততর করছে। এদের সংস্পর্শে এসে ছাত্রসমাজ শিখছে সমস্ত রকম নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে চাকরি, ডিগ্রি অর্জন করা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, চাটুকারবৃত্তি। আদর্শহীনতা সমাজজীবনকে কলুষিত করছে। মিথ্যাচার, জালিয়াতি, দুর্নীতির বিষবাষ্পে যদি শিক্ষার অঙ্গন এমন করে কলুষিত হয় — তাহলে আগামী দিন যে আরও ভয়ঙ্কর হবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সেই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমরা মনে করি — চাই সর্বস্তরের মানুষের সচেতন উদ্যোগ। একদিকে দাবি তুলতে হবে — সমস্ত অবৈধ নিয়োগ এবং প্রকাশিত সকল দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। দোষীদের দিতে হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। যতদিন না বিচারে তাঁরা নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন ততদিন সরকারি সমস্ত পদ থেকে তাঁদের অপসারিত করতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে দলবাজী বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমবাংলার জনমত জাগ্রত হলেই এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ খাড়া করতে পারলেই একমাত্র শিক্ষায় এই দূষিত পরিবেশকে জনগণ কলুষমুক্ত করতে পারবেন। একথা তো প্রমাণিত যে, সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ গণপ্রতিরোধ সঠিক নেতৃত্বে গড়ে উঠলে — তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তা না হলে পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির পুনঃপ্রবর্তনে সিপিআই(এম) ফ্রন্ট সরকারকে বাধ্য করা যেত না। শিক্ষার মানের সামগ্রিক অবনমনের বিরুদ্ধে তেমন আন্দোলন আজ জরুরি।

বন্যাত্রাণে মুক্তহস্তে সাহায্য করুন

বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গের বন্যার্ত মানুষদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ২৫ জুলাই এস ইউ সি আই-এর ত্রাণসংগ্রহ অভিযান

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net